Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2024
DOI: https://doi.org/10.52805/zvv6f590

ইজতিহাদ ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি মৌলিক স্তম্ভঃ একটি ফিকহি বিশ্লেষণ

Md. Abdul Jalil [1], Md. Tuhin Mia[2] and Md. Mahmudul Hasan Razib[3]

ABSTRACT
Ijtihad is one of the fundamental pillars of Islamic jurisprudence, representing the process of independent reasoning exercised by Islamic jurists. It plays a vital role in the development of Islamic legal thought and in addressing complex contemporary issues. While the Qur'an, Hadith, Ijma (consensus), and Qiyas (analogical reasoning) are the primary sources of Islamic law, the continued relevance of Shari'ah in changing contexts necessitates the ongoing practice of Ijtihad. This study analyzes the historical significance of Ijtihad, the concept of the "closure of the gates of Ijtihad," and the need for its revival in modern times. It further explores how a dynamic practice of Ijtihad can harmonize Islamic values with advancements in science, technology, and global culture, thereby ensuring the effectiveness of Islamic law in meeting the needs of future generations.

KEYWORDS
Ijtihad, Islamic Law, Closure of the Gates of Ijtihad, Islam and Contemporary Challenges, Islamic Jurisprudence, Fiqhi Analysis, Religious Revival

১. ভূমিকা (Introduction)

ইসলামী আইনবিদ্যা বা ফিকহ হলো সেই শাস্ত্র, যার মাধ্যমে ইসলামী আইনের বিধানসমূহ কুরআন, সুন্নাহ (রাসূল সা.-এর বাণী ও কার্যাবলি), ইজমা (ঐক্যমত), এবং কিয়াস (তুলনামূলক বিশ্লেষণ)-এর মতো মূল উৎস থেকে করা হয়। এই সূত্রগুলোর মধ্যে ইজতিহাদ যা হল যোগ্য ইসলামিক পণ্ডিতদের স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল ভূমিকা পালন করে। ইসলামী আইনবিদ্যার একটি মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে, ইজতিহাদ এমন একটি প্রক্রিয়া যা শরিয়াহকে সময়ের পরিবর্তন, নতুন বাস্তবতা এবং সমাজের বিকাশমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। ইজতিহাদ, যা ইসলামিক ফকিহদের (Islamic jurists) দ্বারা ব্যবহৃত স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া, ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামি চিন্তাবিদরা আল্লাহর নির্দেশনাকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগযোগ্য করে তোলে, যার ফলে ইসলামী আইন একইসাথে চিরন্তন এবং বাস্তব-জীবনে প্রাসঙ্গিক রয়ে যায়।

ইজতিহাদের ধারণাটি ইসলামী আইনের স্বভাবগত গঠনেই নিহিত, কারণ শরিয়াহ যদিও ঐশী নির্দেশনাভিত্তিক, তবে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সময় ও সমাজভেদে পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, বহু আলেম এমন বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যেগুলোর সুনির্দিষ্ট উত্তর মূল গ্রন্থসমূহে ছিল না। এই ইজতিহাদই

[1] Professor and Chairman of the Department of Law, World University of Bangladesh. Email: jalil11@law.wub.edu.bd, dearbangla2011@gmail.com
[2] Assistant Professor, Department of Law, World University of Bangladesh.
Email: tuhin.mia@law.wub.edu.bd
[3] Assistant Professor, Department of Law, World University of Bangladesh.
Email: raziv1@law.wub.edu.bd

ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন মাযহাব বা স্কুল অব থটের ভিত্তি স্থাপন করে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, "ইজতিহাদের দরজা বন্ধ," অর্থাৎ নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে, এবং ফিকহে কেবল পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাগুলোর অনুসরণেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

আধুনিক বিশ্বে মুসলমানরা যে অভূতপূর্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, তা নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে তোলে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরিবেশ সংকট, লিঙ্গবৈষম্য ও বিশ্বায়নের মতো বিষয়সমূহ ফিকহি ব্যাখ্যার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। তাই ইজতিহাদের পুনরুজ্জীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান এখন সময়ের দাবি।

এই গবেষণাপত্রে ইসলামী আইনবিদ্যার একটি অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে ইজতিহাদের নীতিগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে এর ঐতিহাসিক বিকাশ, পদ্ধতিগত ভিত্তি, স্থবিরতার প্রভাব এবং পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। সমসাময়িক চিন্তাবিদরা কীভাবে ইজতিহাদের আধুনিক ব্যবহার করে ইসলামী মূল্যবোধকে আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করছেন, তাও এতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইজতিহাদের ধারাবাহিক চর্চা কেবল আইনগত নমনীয়তাই নয়, বরং শরিয়াহর অন্তর্নিহিত ন্যায়, দয়া ও জনকল্যাণ (মাসলাহা)-এর আদর্শ রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

এই গবেষণায় সমসাময়িক মুসলিম সমাজের জটিল ও পরিবর্তনশীল সমস্যাগুলোর সমাধানে ইজতিহাদের ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা অন্বেষণ করা হয়েছে। যদিও ইসলামী আইনের মূল উৎস-কুরআন, হাদিস, ইজমা (ঐক্যমত) এবং কিয়াস (তুলনামূলক বিচার) সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধানে চিরস্থায়ী নির্দেশনা প্রদান করে, নতুন পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জগুলির জন্য নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে এর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগযোগ্যতা বজায় থাকে। এই গবেষণাটি ইজতিহাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেছে, প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতদের দ্বারা এর ব্যবহার এবং বিশেষ করে "ইজতিহাদের দরজা বন্ধ" মতবাদের প্রভাবের পরবর্তী করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক ইসলামিক আইনশাস্ত্রের তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এই গবেষণা প্রমাণ করে যে ইজতিহাদের পুনর্জীবন ও ধারাবাহিকতা অপরিহার্য, কারণ এটি নতুন আইনি, নৈতিক, এবং সামাজিক সমস্যার প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করবে। এছাড়াও, গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে কীভাবে চলমান ইজতিহাদ প্রথাগত ইসলামিক মূল্যবোধের সাথে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এবং বিশ্বায়িত সংস্কৃতির অগ্রগতিকে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের সাথে ইসলামী আইনকে কার্যকর রাখবে। এই গবেষণায় ইজতিহাদ কে মূলতঃ ইসলামিক আইনবিদ্যার একটি অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

২. ইজতিহাদ কি (What is Ijtihad)?

আল-ইজতিহাদ শব্দটি জুহদুন্ শব্দ থেকে গৃহিত হয়েছে। জুহদুন্ শব্দের অর্থ চেষ্টা করা, সাধনা করা। কাজেই ইজতিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা করা বা সাধনা করা। এ চেষ্টা বা সাধনা শারিরিক হতে পারে, মেধাভিত্তিকও হতে পারে। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় পবিত্র কুরআন ও প্রামাণিক হাদিসের ভিত্তিতে ইসলামী শরিয়তের আহকাম উদঘাটন করার চেষ্টা ও সাধনাকে ইজতিহাদ বলে।

ইমাম গাজালী (রঃ) এর মতেঃ ইজতিহাদ শরীয়তের উৎসসমূহ যেমন কুরআন ও হাদিস থেকে আইনগত বিধান নির্ধারণের জন্য একজন মুজতাহিদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নির্দেশ করে। ইজতিহাদ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন যোগ্য পণ্ডিত (মুজতাহিদ) গভীর যুক্তি এবং চিন্তাশীলতার মাধ্যমে আইনি বিধান বের করে থাকেন। এমনকি যদি ইজতিহাদের ফলে নির্ধারিত বিধান ভুলও হয়, তবুও আল্লাহ তায়ালা সেই মুজতাহিদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য তাকে পুরস্কৃত করবেন (ইমাম আল-গাজালী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২৪৫ ২৫০)।

প্রফেসর মুহাম্মাদ হাশিম কামালীর মতে, শরিয়তের বিধিবিধান অনুমান করার জন্য যখন একজন ইসলামী আইনবিদ্ (মুজতাহিদ) তার সব দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়োগ করেন, তখন সেই প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ বলে (কামালী, ১৯৯১, ৩৬৭)। আব্দুর রহিমের মতে, "Ijtihad is the capacity for making deductions in matters of law and in cases to which no expressed text or rule is available in the Quran, hadis, ijma and qiyas." অনুবাদঃ "ইজতিহাদ হলো কোন আইন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করার যোগ্যতা, যে বিষয়ে কুরআন, হাদিস, ও ইজমাতে স্পষ্ট কোন সমাধান নেই" (আব্দুর রহিম, ১৯৯০, ১৬৯)। প্রফেসর ড. ফাইজউদ্দীনের মতে, "Ijtihad means the all-out efforts made by an Islamic jurist in order to infer with a degree of probability the rules of shariah from their detailed evidence in sources." অনুবাদঃ "যখন একজন ইসলামী আইনবিদ্ (মুজতাহিদ) শরিয়তের উৎসগুলো থেকে শরিয়তের বিধান অনুমান করার জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টা নিয়োগ করেন, সেই প্রচেষ্টাগুলোকে ইজতিহাদ বলে" (ফাইজউদ্দীন, ২০০৮, ৩৪)।

কাজেই, মুজতাহিদরা তাঁদের সকল দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়োগ করে যখন শরিয়তের কোন নতুন বিধান তৈরী করেন, যে বিষয়ে পূর্বে কোন সমাধান কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসে ছিল না, সেই নতুন বিধানকে ইজতিহাদ বলে। সকল মুসলমানদেরকে প্রামাণিক ইজতিহাদ মেনে চলতে হবে এবং নতুন করে ঐ বিষয়ে আবার ইজতিহাদ করার দরকার হবে না। তাই প্রফেসর মোহাম্মাদ ফাইজউদ্দীন তাঁর বইতে লিখেছেনঃ "Ijtihad signifies the finding out a solution of a new problem regarding which Quran and hadis are silent and there is no ruling in ijma or qiyas on it." অনুবাদঃ "যখন কোন নতুন বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে কোন সমাধান থাকে না এবং এ বিষয়ে ইজমা ও কিয়াসেও কোন রুলিং থাকে না, তখন সে বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান পেশ করা হয়" (ফাইজউদ্দীন, ২০০৮, ৩৪)।

আমরা সমাজ জীবনে চলার পথে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় বর্তমান কালে নানাবিধ নতুন বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছি যেগুলোর ইসলামী সমাধান মুসলিম উলামাদের দিতে হবে কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, ইস্তিছ্লাহ্ ও ইছতিল্লাল্ এর ভিত্তিতে। এই ইসলামী সমাধান গুলোকে ইজতিহাদ বলে। সুসলিম উম্মাহকে মুজতাহিদের প্রণীত ইজতিহাদ্গুলো মেনে চলতে হবে। সেকারণে ইসলামী সহযোগীতা সংস্থা (Organization of Islamic Cooperation) সংক্ষেপে বলা হয় OIC - এর তত্ত্বাবধানে একটি Ijtihad Board ঘঠন করতে হবে। এই বোর্ডের কাজ হবে নতুন ইজতিহাদগুলো সংগ্রহ করা, মুসলিম দেশগুলোকে অবহিত করা এবং সেগুলো মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা।

৩. ইজতিহাদের অপরিহার্যতা (Importance of Ijtihad)

ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সব যুগেই রয়েছে। মুহাম্মদ (স:) এর সময়ে, সাহাবী এবং তাবেঈনদের সময়ে ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল এবং ইজতিহাদ করা হয়েছে। বর্তমান সময়েও ইজতিহাদ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীতা আছে। নবী মুহাম্মাদ (স:) এর সময়ে নতুন কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে নবী (স:) নিজেই ইজতিহাদ করে সমাধান দিতেন যদি কুরআনে ঐ বিষয়ে স্পষ্ট কোন সমাধান পাওয়া না যেত।

নবী (স:) এর মৃত্যুর পর সাহাবীরা, তাবেয়ীরা ও তাবেতাবেয়ীরাও ইজতিহাদ করে নতুন সমস্যার সমাধান দিতেন। বর্তমান সময়ে সময়ের বিবর্তনে অনেক নতুন সমস্যার বা বিষয়ের উদ্ভব হচ্ছে। এ বিষয়গুলোর সমাধান বর্তামান সময়ের ফকিহঙ্গণকে দিতে হবে। তবে একই বিষয়ে ইজতিহাদের ভিন্নতা থাকলে যার কাছে যার মতামতটি

উত্তম বলে মনে হবে, সে সেটা গ্রহন করবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন ভাবেই বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তাতে একাদিকে যেমন সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হবে অন্যাদিকে তেমনি মহান আল্লাহ ক্ষুব্ধ হবেন। সুতরাং আমারা বলতে পারি সময়ের পরিবর্তনে নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে তার সমাধানে ইজতিহাদ করা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে সমাজ ব্যবস্থা থমকে দাঁড়াবে, সামনে অগ্রসর হতে পারবে না।

ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কোন ইজতিহাদ করা চলবে না। কারণ সেগুলো কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু মুয়ামালাত সংক্রান্ত বিষয়গুলো জন্নী দলিল দ্বারা প্রমাণিত। জন্নী দলিল অর্থ যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হাদিস আছে এবং ইমামদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। যে সকল বিষয়ে জন্নী দলিল রয়েছে, সেসকল বিষয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এসকল বিষয়ে কোন্টি মেনে চলবো তা জানার জন্য উলামায়ে কেরামদের সিদ্ধান্ত (ইজতিহাদ) খুবই জরুরী।

সমাজে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব হবে কিয়ামত পর্যন্ত। আর মুজতাহিদদের ঐ নতুন বিষয়েগুলোর উপর ইজতিহাদ করে জনগণকে সমাধান দিতে হবে। তাই বলা যায় ইজতিহাদের চর্চা কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে (ফাইজউদ্দীন, ২০০৮, ৩৪)। সে কারণে কখনও ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করা যাবে না। তবে মুজতাহিদগনের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন তাঁদের ইজতিহাদ কোন ভাবেই কুরআন ও প্রামাণিক হাদিসের সংগে সাংঘর্ষিক না হয়, বরং কুরআন ও হাদিসের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৪. ইজতিহাদ করার বৈধতা (Validity of Ijtihad)

ইজতিহাদ করা বৈধ (Valid), কারণ ইজতিহাদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের অনেক দলিল আছে। জ্ঞান অর্জনের জন্যে চিন্তা ও সাধনা করাও ইজতিহাদ। আর একটি হাদিসে মুহাম্মাদ (স:) বলেছেন ইজতিহাদ করা সওয়াবের কাজ। মহান আল্লাহ্ ইজতিহাদ করার অনুমতি দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ "আর তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফল দুই দুই প্রকারে সৃষ্টি করেছেন (টক ও মিষ্টি, ছোট ও বড়); তিনি দিনকে রাত্রিদ্বারা ঢেকে দেন। এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" [সুরা রাদ, ১৩:৩]

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন যাতে আমরা এ চিন্তা-গবেষনা থেকে জ্ঞান অর্জন করে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যান লাভ করতে পারি। সুতরাং এ আয়াতে চিন্তা-গবেষণা তথা ইজতিহাদ করার পারমিশন রয়েছে। অন্য একটি আয়াতে মহান আল্লাহ পাক বলেছেনঃ" আমি তোমার (মুহাম্মাদ স:) উপর সত্যসহ কিতাব নাজিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ যা তোমাকে জানিয়েছেন তার আলোকে বিচার-ফয়সালা করো।" [সুরাহ নিসা, ৪:১০৫] এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আল্ কুরআনের জ্ঞান অর্জনের এবং তার আলোকে সমস্যার সমাধানের কথা বলেছেন। কাজেই এটিও ইজতিহাদ করার পক্ষের আয়াত।

শেষ নবী মহাম্মদ (স:) বলেছেন, "একজন বিচারক বিচার-ফয়সালা করতে গিয়ে যদি ইজতিহাদ করেন এবং তাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তিনি দুটি সওয়াব পাবেন। আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহলে তিনি একটি সওয়াব পাবেন।" (সহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৭৩৫২; সহীহ্ মুসলিম্, হাদিস নং ১৭১৬)। বিচার-ফয়সালা করতে বসে একজন বিচারককে অনেক সময় ইজতিহাদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যখন কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসে কোন স্পষ্ট বিধান পাওয়া যায় না। তাই এই হাদিসে বিচারককে আল্লাহ্ রসূল মুহাম্মাদ (স:) ইজতিহাদ করার অনুমতি দিয়েছেন এবং ইজতিহাদ করার কারণে একজন বিচারক সওয়াবের অধিকারী হবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

অন্য একটি হাদিসে আছে, "মুহাম্মাদ (স:) মুয়ায ইবনে যাবাল (রা:) কে ইয়ামানে বিচারক হিসাবে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবে? মুয়াজ (রা:) জবাব দিলেন, আল্লাহ্ কিতাব আল-কুরআন দ্বারা। মুহাম্মাদ (স:) বললেন, যদি কুরআনে ঐ বিষয়ে তুমি কোন সমাধান না পাও, তবে কি করবে? মুয়াজ (রা:) উত্তর দিলেন, সেক্ষেত্রে হাদিস দ্বারা বিচার-ফয়সালা করবো। রসুলুল্লাহ (স:) বললেন যদি হাদিসে ঐ বিষয়ে স্পষ্ট কোন বিধান না পাও, তাহলে কি করবে? মুয়াজ (র:) জবাব দিলেন, সেক্ষেত্রে আমি ইজতিহাদ করবো এবং বিচার-ফয়সালা করবো। তখন রসুলুল্লাহ (স:) বললেন, তুমি সঠিক উত্তর দিয়েছো। তারপর তিনি মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, মহান আল্লাহ্ শোকর যিনি তাঁর রসুলের প্রতিনিধিকে সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন" । (সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৫৯২)। এই হাদিস থেকে আমার স্পষ্ট বিধান পায় যে, সমাজে যদি সময়ের প্ররিক্রমায় নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধান কুরআন, হাদিস, ইজমা বা কিয়াসে নাই, সেক্ষেত্রে ফকিহ্রা বা বিচারকরা ইজতিহাদ করে সঠিক সমাধান দিবেন।

মুহানবী মুহাম্মাদ (স:) এর যুগে যেসকল সাহাবী গর্ভরনর নিযুক্ত হয়ে দূর-দুরান্তে কোন অঞ্চল শাসন করতেন এবং বিচারক হিসাবে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন তাদের মুহাম্মাদ (স:) এর সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় ও বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সে বিষয়ে তাদের জানা কুরআনের আয়াত এবং হাদিস দ্বারা সমাধান করতেন। কিন্তু তাঁরা যদি সে প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধান কুরআন বা হাদিসে না পেতেন, তাহলে তাঁরা ইজতিহাদ করতেন এবং মুহাম্মাদ (স:) এ সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার পারমিশন দিয়েছেন। তাই বর্তমান যুগে বিচার-ফয়সাল করার সময় বা রাজ্য শাসন করার সময় বা অন্য কোন ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিলে যার সমাধান কুরআন ও হাদিসে নাই, সেক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদ করতে পারবো। আর এ ইজতিহাদ করায় প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

৫. মুজতাহিদ কে (Who is a Mujtahid)?

মুজতাহিদ সেই ব্যক্তি যিনি ইজতিহাদ করেন বা করতে পারেন। যার ভিতর ইজতিহাদ করার যোগ্যতা আছে, তিনি ইজতিহাদ করবেন এবং আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজে (Knowledge society) উদ্ভুত নতুন সমস্যাগুলোর সমাধান দিবেন। প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ফাইজ উদ্দীন তাঁর বইতে মুজতাহিদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ "Literally speaking, mujtahid is one who can exercise ijtihad. But legally speaking, a mujtahid is one who strives hard to find out a solution of a new legal issue, which has not been solved directly in the Quran, hadis, ijma or qiyas." বাাংলা অনুবাদে বলা যায়ঃ আক্ষরিক অর্থে, মুজতাহিদ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইজতিহাদ করতে পারেন। কিন্তু আইনের পরিভাষায়, মুজতাহিদ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসে নাই এমন কোন নূতন আইনি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে কঠোর গবেষণা করেন। (মুহাম্মাদ ফাইজ উদ্দীন, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৫)

৬. মুজতাহিদ হওয়ার যোগ্যতা (The Necessary Qualifications to be a Mujtahid)

ইজতিহাদ করতে হলে একজন মুজতাহিদকে অবশ্যই কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যে যোগ্যতাগুলোকে ইজতিহাদ করার শর্ত বলা যায়। (ওয়েল বি. হাল্লাক, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৪)। সে যোগ্যতাগুলো নিম্নরূপঃ

১. একজন মুজতাহিদকে অবশ্যই বালেগ এবং সুস্থ মস্তিেস্কর অধিকারী হতে হবে।

২. আল কুরআনে ৫০০ আয়াতুল আৎকাম (বিধিবিধান সম্বলিত আয়াত) আছে। একজন মুজতাহিদকে অবশ্যই এই আয়াতগুলোর উপর পূর্ণজ্ঞান থাকতে হবে।

৩. হাদিস শরীফগুলোতে ৩০০০ আহাদিসুল আহকাম আছে। একজন মুজতাহিদকে এইসকল আহাদিসুল আকামের উপর পান্ডিত্য অর্জন করতে হবে।

৪. ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস হচ্ছেঃ কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। আর এ উৎসগুলো আরবীতে লেখা। তাই একজন মুজতাহিদকে আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে এবং ইসলামী শরিয়তের মূল উৎসগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। (আবুল হুসাইন আল বাস্রি, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৫-৬); আবু ইসহাক্ আল-সিরাজী, ১৯০৮, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬)।

৫. যে সকল সমস্যার সমাধানে ইজমা করা হয়েছে, সেসকল ইজমার উপর পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে যাতে একজন মুজতাহিদের ইজতিহাদ কোন প্রতিষ্ঠিত ইজমার বিরোধী না হয়।

৬. যে সকল কিয়াস বর্তমানে বিদ্যামান আছে। সেগুলোর উপর একজন মুজতাহিদের পান্ডিত্য থাকতে হবে যাতে তার ইজতিহাদ কোন সুপ্রসিদ্ধ কিয়াসের পরিপন্থী না হয়।

৭. উসুলে ফিক্হ্ হলো ইজতিহাদের মূল স্তম্ভ। তাই একজন মুজতাহিদকে উসুলে ফিরে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

৮. একজন মুজতাহিদকে ইসলামী শরিয়তের উদ্দেশ্য জানতে হবে। ইসলামী শরিয়তের উদ্দেশ্য হলোঃ মানুষের কল্যাণ করা, দীনের সংরক্ষণ এবং মানুষের জান-মালের হিফাযত করা। ইসলামী শরিয়তের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে উদ্ভুত নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়া যেটা একজন মুজতহিদের কাজ।

৯. কুরআনের কিছু আয়াত অন্য আয়াতকে রহিতো (মানুখ) করেছে। আবার কিছু হাদিস অন্য হাদিসকে মানুখ করেছে। তাই একজন মুজতাহিদকে কুরআন ও হাদিসের নাসিখ্ ও মান্সুখের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। রহিতোকারী এবং রহিতোকৃত বিধি-বিধানের জ্ঞান যদি একজন মুজতাহিদের না থাকে তাহলে তিনি ভুল করে মানুখ আয়াত ও হাদিসের ভিত্তিতে ভুল ইজতিহাদ সম্পাদন করতে পারেন।

১০. একজন মুজতাহিদ অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি হবেন এবং ছোট-বড় সব রকমের পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, যাতে মানুষ তার উপর আস্থা আনতে পারে। (মুহাম্মাদ ফাইজউদ্দীন, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৭)।

১১. ইমাম গাজালী (রহঃ) তাঁর বইতে একজন মুজতাহিদকে যে বিষয়গুলো জানতে হবে সেগুলো পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন। (ইমাম গাজালী, দ্বাদশ শতাব্দী পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫৪)

৭. কুরআন ও প্রামানিক হাদিসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ (Ijtihad Should be Bassed on the Quran and the Authentic Hadises)

ইজতিহাদ করার কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আবার মহানবী মুহাম্মাদ (সঃ) হাদিসে আমাদেরকে ইজতিহাদ করতে বলেছেন এবং কখন ইজতিহাদ করা যাবে এবং কখন করা যাবে না, তাও বলেছেন। ইজতিহাদ করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

> "তোমরা যদি কোন বিষয়ে না জানো তাহলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও (সুরাহ নাহলঃ ৪৩; সুরাহ আম্বিয়াঃ ৭)।

এখানে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বরেছেন, কোন অজানা বিষয় তোমাদের সম্মুখে আসলে তোমরা অবশ্যই যারা ঐ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখে তাদের সাথে পরামর্শ করে অথবা তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে, সেক্ষেত্রে অজ্ঞতা বশত ভুল সিদ্ধান্ত নিবে না। এখানে মহান আল্লাহ পাক অজানা বিষয়ের উপর জ্ঞানী ব্যক্তিদের (মুজতাহিদদের) ইজতিহাদ জেনে নিয়ে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

হয়রত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করেছেনঃ

> "আমরা এক সফরে ছিলাম। তখন এক সাহাবীর মাথায় একটি পাথর পড়ল এবং আঘাতে মাথায় ক্ষত দেখা দিল। তিনি সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন, আমার কি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার সুযোগ আছে? তাঁরা বললেন না। কারণ মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'তোমরা অপবিত্র হলে গোসল করে পবিত্র হও।' এমতাবস্থায় কুরআনের এই আয়াতের প্রেক্ষিতে তাঁর জন্য গোসল করা ফরজ হয়। অপারগ হয়ে তিনি গোসল করলেন এবং তাঁর মাথার ক্ষতে পানি লাগার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। সফর থেকে ফেরার পর নবীজী মুহাম্মদ (স:) কে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বললেন, 'না জেনে কথা বলে তারা তাকে মেরে ফেলেছে। আল্লাহ তাদের নাশ করুন। তারা যেহেতু এ বিষয়ের বিধান জানে না, তারা জিজ্ঞেস করে কেন জেনে নেয়নি? অজ্ঞতার সমাধান তো জিজ্ঞেস করার মধ্যেই। তার জন্যে তায়াম্মুম করে নেওয়াটাই যথেষ্ট ছিল'। কারণ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের একই আয়াতে বলেছেন, "আর তোমরা যদি অসুস্থ হও তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও" । [সূরা মায়েদাঃ ৬; সুনান ইবনে মাজাহ্, হাদিস ৫৭২]।

উপরে বর্ণিত হাদিস এবং কুরআনের আয়াত বিশ্লেষন করলে আমরা জানতে পারি যে, কোন বিষয়ে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে আমাদেররকে অবশ্যই একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে থেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ঐ বিষয়ের সমাধান বা ইজতিহাদ কি হবে। আমরা যদি কোন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী না হই, তাহলে সে বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে সমাজের মানুষের ক্ষতি করা যাবে না। মহানবী মুহাম্মদ (স:) তাদের ধ্বংস কামনা করেছেন। কাজেই আমাদেরকে অজানা বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

যে সম্মানিত সাহাবীর মাথায় পাথর পড়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তিনি গোসল না করেও যদি তায়াম্মুম করে নামায পড়তেন বা কুরআন পড়তেন তাহলে হয়তোবা তিনি মারা যেতেন না। ঐ সাহাবীর সাথীরা নিম্নোক্ত আয়াতের উপর নির্ভর করে ফতুয়া দেন বা ইজতিহাদ করেন। আয়াতটি হলো: 'তোমারা অপবিত্র হলে গোসল করে পবিত্র হও'। (সুরা মায়েদাঃ ৬ আয়াত)। কিন্তু তাদের ইজতিহাদ ভুল ছিল। কারণ তারা একই আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাকের আর একটি নির্দেশ লক্ষ্য করেন নাই। আয়াতের সেই অংশে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তোমরা যদি অসুস্থ হও........... তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও'।

কাজেই যে সাহাবী গোসল কারার কারণে মারা যান, তার জন্যে উপরের আয়াত অনুযায়ী তায়াম্মুম করার যথেষ্ঠ ছিল। তাহলে হয়তোবা তিনি গোসল কারার কারণে বেশী অসুস্থ হয়ে মারা যেতেন না। কাজেই মুজতাহিদদেরকে অবশ্যই কুরআনের সঠিক আয়াত অথবা সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে হবে। আর আমরা যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখি না, তাদেরকে অবশ্যই মুজতাহিদদের স্মরণাপন্ন হতে হবে। নিজেদের স্বল্প জ্ঞান প্রয়োগ করে ভুল ইজতিহাদ করা যাবে না।

৮. প্রামাণিক হাদিস কি এবং এগুলো মেনে চলতে হবে কেন? (What is Authentic Hadis and Why is It Necessary to Follow?)

মহানবী (সঃ) যাকিছু বলেছেন, যাকিছু করেছেন, সাহাবীদের যাকিছু করার অনুমোতি দিয়েছেন বা সাহাবীরা যাকিছু করেছেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ (সঃ) তার বিরোধীতা করেন নাই, সেসকল কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে। তাছাড়া মহানবী (সঃ) এর জীবনাচরণ, গুনাবলী এবং তাঁর দৈহিক বর্ণনা ইত্যাদিও হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। হাদিসে কুদ্সীও হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। যে হাদিসগুলোর মূল বক্তব্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ইল্‌লহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে মহানবী (সঃ) কে জানিয়ে দিয়েছেন অথবা জীবরাইল (আঃ) মহানবী (সঃ) কে বলেছেন কিন্তু তা কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং পরবর্তীতে মহানবী (সঃ) নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন, সে হাদিসগুলোকে হাদিসে কুদ্সসী বলে।

ইজতিহাদ করতে হলে মুজতাহিদদেরকে প্রামাণিক হাদিসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে হবে। সহীহ ও মুত্তাসিল হাদিসগুলোকে প্রামাণিক হাদিস বলে। যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে, সনদের প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর নাম, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, আস্থাভাজন, স্মরণশক্তির প্রখরতা এবং কোন স্তরে তাদের সংখ্যা একজন হয়নি, তাকে সহীহ হাদিস বলে। আর যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে এবং কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল হাদিস বলে।

কোন ইজতিহাদ্ যদি প্রামাণিক হাদিসের ভিত্তিতে করা হয় এবং তিন, পাঁচ বা ততোধিক মুজতাহিদ একত্রে আলোচনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠর ভিত্তিতে করা হয়, তাহলে সেই ইজতিহাদ অবশ্যই গ্রহনীয় এবং পালনীয়। আমাদেরকে অবশ্যই সহীহ ও মুত্তাসিল হাদীসগুলো মেনে চলতে হবে। আমরা যদি হাদিস অস্বীকার করে শুধু কুরআন মেনে চলি, তাহলে আমরা অনেক সমস্যায় পড়বো এবং আল্লাহ্ সেটা আমাদের কাছে থেকে গ্রহন করবেন না। পবিত্র কুরআনে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু নামাজ আমরা কিভাবে পড়বো তা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। নামাজ কিভাবে পড়বো এবং নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মুস্তাহাবগুলো আল্লাহ্র রসুল মুহাম্মাদ (সঃ) হাদিসে ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রাকটিক্যাল নামায পড়ে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমরা যদি শুধু কুরআন মানি আর হাদিস অস্বীকার করি, তাহলে আমরা সঠিকভাবে নামাজ পড়তে পারবো না এবং অন্যান্য কাজও সঠিক নিয়মে করতে পারবো না। মহান আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ (সঃ) কে কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে এবং আমরা ইসলাম ধর্ম এবং জীবন বিধান কিভাবে মেনে চলবো, তা প্রাকটিক্যালী দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

> "অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে, আর তাদের কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল" (সুরাহ্ আল্ ইমরান, ৩: ১৬৪; সুরাহ আল্ বাকারাহ্ ২:১২৯)।

উপরের আয়াতে মহান আল্লাহ পাক 'কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়' বলতে মুহাম্মাদ (সঃ) কে 'কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা' বুঝিয়েছেন। মুফতি মাহমুদ হাসান উপরের আয়াত দুটি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেছেন:

> "রসুলুল্লাহ (সঃ) এর দায়িত্ব কেবল আল্লাহ্ নাজিলকৃত কুরআন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নয়, বরং তাঁর মৌলিক দায়িত্ব ছিল চারটি, যথাঃ (১) কুরআন পাঠ করে শুনানো; (২) মানবজাতির চরিত্র পরিশুদ্ধ করা, (৩) তাদের আমল পরিশুদ্ধ করা; এবং (৪) তাদের কুরআনের ব্যাখ্যা ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেওয়া"। (মুফতি মাহমুদ হাসান, ২০২০)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে একই সাথে কুরআন ও হাদিস মেনে চলতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো যদি তোমারা মুমিন হও" । (সুরাহ আনফালঃ ১)। সুতরাং আমরা যদি মুহাম্মাদ (সঃ)

ও তার হাদিস ও সুন্নাহ অমান্য করি, তাহলে আমরা মুমিন হতে পারবো না। অন্য একটি আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "যে রসুলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্ অনুগত্য করলো"। (সুরাহ নিসা, ৪: ৮০)। এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক স্পষ্ট করে বলেছেন যে তাঁর রসুলের হাদিস এবং সুন্নাহ্ মেনে চললে তাঁর (আল্লাহ্) অনুগত্য করা হবে। আর তাঁর রসুলের হাদিস এবং সুন্নাহ মেনে না চললে তাঁর (আল্লাহ্) নাফরমানি করা হবে এবং দোযখে যাবে।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা অনেকগুলো সুরাতে এবং প্রায় অর্ধশত আয়াতে একই সাথে তাঁর এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সুরাহ নিসা: ১৪, ১১৫; সুরাহ আহযাব: ৩৬, ৭১; সুরা নূর: ৫৪; সুরাহ বাকারাহ: ১২৯)। আর রসুলের আনুগত্য করা মানে তার সুন্নাহ এবং হাদিস মেনে চলা। সুতরাং আল্-কুরআন এবং মুহাম্মাদ (স:) এর সুন্নাহ এবং সহীহ হাদিসসমূহ মেনে চললে কেবল বিশ্বমানবতা পরকালের মুক্তির সনদ পাবে তথা 'মহা সাফল্য' অর্জন করতে পারবে। পরকালের এ 'মহা সাফল্যকে' মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে অনেকবার 'ফাউযুল আযিম' বলে উল্লেখ করেছেন। কেহ যদি শুধু কুরআন মেনে চলে, আর সহীহ্ হাদিস ও সুন্নাহগুলো অমান্য করে চলে, তাহলে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে এবং দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে মুফতি মাহমুদ হাসান লিখেছেনঃ

> "কুরআনুল কারিমে প্রায় আর্ধশত আয়াতে রসুলুল্লাহ্ (স:) এর আনুগত্যের নির্দেশ এবং তাঁর অবাধ্যতার প্রতি নিষেধ করা হয়েছে। অতএব যারা বলবে যে কুরআন মানি কিন্তু হাদিস মানি না, তারা কুরআনুল কারিমের প্রায় অর্ধশত সুস্পষ্ট আয়াতের অস্বীকারকারী"। (মুফতি মাহমুদ হাসান, ২০২০)

গতশতক থেকে কিছু লোক শুধু কুরআন মেনে চলবে এবং হাদিস ও সুন্নাহ মেনে চলবে না বলে প্রচার করছে। আল্লাহ্র কুরআন অনুযায়ী তারা মুমিন এবং মুসলমান নয়। তাদেরকে পরকালে কঠিন জবাবদিহিতার এবং আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুফতি মাহমুদ হাসান লিখেছেনঃ

> "হাদিস ও সুন্নাহ্ অস্বীকার প্রকারান্তরে পবিত্র কুরআনের অস্বীকার করা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিবষয় যে, গতশতক থেকে কিছু লোক এক অজানা উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ (স:) এর হাদিসের অগ্রহনযোগতার ব্যাপারে আলোচনা ওঠায় এবং শুধু কুরআন মানার স্লোগান ওঠায়। এটি সর্বসম্মাতিক্রমে একটি ভ্রান্ত ও কুফরি মতাদর্শ" । (মুফতি মাহমুদ হাসান, ২০২০)

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন্ নাজিল করেছেন এবং মানুষের জন্য বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই বিধি-বিধান কিভাবে মেনে চলতে হবে তা ব্যবহারিকভাবে (Practically) মুহাম্মাদ (স:) মানুষকে দেখিয়ে গেছেন, যাতে মানুষ জানতে পারে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান কিভাবে বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হবে। কুরআনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ পাক তাঁর রসুলকে প্রথমে মদিনা এবং পরবর্তীতে মক্কা এবং মদিনার রাষ্ট্র প্রধান বানিয়েছিলেন। মুলতঃ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সাথে মহানবী (স:) কে পাঠিয়েছিলেন কুরআনের বিধি-বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠা করে দেখানোর জন্য। সেকারণে মুহাম্মাদ (স:) ছিলেন পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা ও পবিত্র কুরআনকে সমাজে প্রতিষ্ঠাকারী। কাজেই মুহাম্মাদ (স:) এর সহীহ হাদিস ও সুন্নাহগুলোকে আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তাঁর হাদিস ও সুন্নাহগুলো যদি আমরা পরিত্যাগ করি তাহলে আমরা গোমরাহী হয়ে যাব এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব। কাজেই যারা হাদিস ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে শুধু কুরআন মেনে চলতে চান, তারা ভুল পথে হাটছেন। মাহান আল্লাহ্ তাদের কুরআন ও সুন্নাহ্ পথে ফিরিয়ে আনুন এবং মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করুন এই দোয়া করি। মুহাম্মাদ (স:) কে মহান আল্লাহ্ পাক কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা বানিয়েছিলেন, সেটা তিনি নিজেই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

> "আর আপনার প্রতি নাজিল করেছি কুরআন, যাতে আপনি মানুষেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে"। (সুরাহ নাহলঃ ৪৪)।

কাজেই পবিত্র কুরআন সংক্ষিপ্ত আকারে এবং এর শেষ সুরাগুলো কবিতা আকারে মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন আর সেগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝানোর জন্যে মুহাম্মাদ (সঃ) কে রসুল বানিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ (সঃ) কুরআনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছিলেন সবকিছুই মহান আল্লাহর কথা, মহান আল্লাহ তাঁর অন্তরে অহীর মাধ্যমে জ্ঞান দিতেন আর সে জ্ঞান দিয়েই তিনি কুরআনের ব্যাখ্য করতেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক বলেনঃ "তিনি তোমাদের নবী মুহাম্মাদ (সঃ) কোন মনগড়া কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন তা কেবল ওহি যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" (সুরাহ নাজমঃ ৩-৪)।

মহানবী (সঃ) দ্বীনের ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহি হিসাবে মহান আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরে নাজিল করতেন। মহানবী (সঃ) এর কথা ও কাজ যে ওহি সে সম্পর্কে মুফতি মাহমুদ হাসান বলেছেনঃ "সুরা নাজমের ৩ ও ৪ আয়াতে মহানবী (সঃ) এর কথাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ওহি বলেছেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) তার নবুয়তি জীবনে দুই ধরনের কথা বলেছেনঃ (১) কুরআনের আয়াতসমূহ; (২) কুরআনের আয়াত ছাড়া অন্য কথা। এই দুই আয়াতে শুধু কুরআনের আয়াতসমূহকে ওহি বলা হয় নাই, বরং রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর সব কথাকেই ওহি বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ওহি দুই প্রকারঃ (১) কুরআনের আয়াতসমূহ্ (২) কুরআনের আয়াতসমূহ ছাড়া রসুলুল্লাহ (সঃ) এর অন্য কথা। আর এই দ্বিতীয় প্রকারের ওহিকেই হাদিস ও সুন্নাহ্ বলা হয়, যা আল্লাহ ও রসুলুল্লাহ (সঃ) এর উপর ঈমান আনায়নকারী সবার জন্য বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করা অপরিহার্য"। (মুফতি মাহমুদ হাসান, ২০২০)

কাজেই আমাদের আবশ্যই মহানবী (সঃ) এর কথা কাজ এরং সম্মতিগুলো মেনে চলতে হবে। কারণ সেগুলো ওহি। সেগুলো মেনে না চললে কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর আলোকে আমরা সত্যিকারের মুমিন হতে পারবো না, এমনকি সেগুলো অস্বীকার করলে আমরা অবিশ্বাসী হয়ে যাবো এবং দোযখের শাস্তি পাবো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক বলেনঃ

> "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নাফরমানি করে এবং তাঁর সীমারেখা লজ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে জ্বালাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক আযাব।" (সূরা নিসাঃ ১৪)।

ইসলামের প্রথম দুই হিজরী শতব্দীতে কেহ হাদিস আস্বীকার করার সাহস পাই নাই। সর্বপ্রথম শরিয়তের দলিল হিসাবে হাদিস মানতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে মুতাযিলা সম্প্রদায় দ্বিতীয় হিজরীর শেষ দিকে। আর পরবর্তীতে যারা হাদিস মানতে অস্বীকৃতি জানায় তা মূলত মুতাযিলা সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে। (শায়েখ আহমাদুল্লাহ, ২০২২)। বর্তমান কালে (২০২২-২০২৩ সালে) একটি গ্রুপ হাদিস অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে বাংলাদেশে যারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে অভিহিত করে।

যারা বলে আমরা আহলে কুরআন তারা আসলে কুরআন মানে না। তারা বিভ্রান্ত, কারণ মহান আল্লাহ্ পাক বলেছেন, 'তোমরা আনুগত্য করো আমার, আমার রসুলের এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের'। কিন্তু যারা আহলে কুরআন, তারা কুরআনের এই আয়াত মানে না। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রসুলকে অনুসরণ করল, সে আল্লাহকে অনুসরণ করলো'। (সূরা নিসা, ৪: ৮০)। কিন্তু আহলে কুরআনের লোকেরা রসুলকে অনুসরণ করে না, আর এ আয়াত অনুযয়ী তারা আল্লাহকেও অনুসরন করে না। আহলে কুরআনের লোকেরা হাদিস মানতে নারাজ। তারা বলে হাদিস সহীহ্ নয়। এ প্রসঙ্গে শাইখ্ আহমাদুল্লাহ বলেছেনঃ

> "সারা বিশ্বের সবযুগের সব আলিম ও ইমামরা হাদিস আস্বীকারকারীদের ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার ব্যাপারে একমত। হাদীস সংকলন, রিজালশাস্ত্র ও জরাহ-তা'দীল প্রভৃতি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখা কোনো মানুষ হাদিসের প্রামানণ্যতা অস্বীকার করতে পারে না"। (শায়েখ আহমাদুল্লাহ, ২০২২)

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও পবিত্রতার পদ্ধতি আলোচনা করেন নাই। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) এগুলোর পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সাহাবীদের প্রাকটিক্যালী শিখিয়ে গেছেন। কাজেই আহলে কুরআনের লোকেরা হাদিস না মানলে ইসলামের এ মৌলিক বিধানের পদ্ধতি কিভাবে জানবে? এ সম্পর্কে শায়েখ আহমাদুল্লাহ বলেছেন, "শুধু কুরআন থেকে সালাতের কোন বিবরণ তো পরের কথা সালাতের আগের কাজ আযান ও পবিত্রতার পদ্ধতিও প্রমাণ করা যাবে না। এ গুলোর বিবরণের ও পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হবে হাদিসের। যাকাত ও অন্যসব বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। মুলত, কুরআনকে যদি থিওরী বলা হয় তাহলে হাদিসকে তার প্রাকটিক্যাল বলা যায়"। (শায়েখ আহমাদুল্লাহ, ২০২২)

আহলে কিতাবের লোকেরা কুরআনের অনেক আয়াত মানে না যেখানে মাহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুল মুহাম্মাদ (স:) এর আনুগত্য করার এবং তিনি যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন সেগুলো অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। "আহলে কুরআন" এর লোকেরা কুরআনকে "আহসানুল হাদিস" সর্বোত্তম হাদিস বলে। তারা শুধু কুরআন মেনে চলতে চায়, হাদিস মেনে চলতে চায় না। কুরআনের বাইরে যা কিছু আছে সেগুলোকে তারা "বাজে কথা" বলে। এসব কথা বলা ঠিক নয়। তারা নবী-রসুলদেরকেও স্বীকৃতি দেয় না।

মুফতি এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী বলেছেন, 'আহলে কুরআন' নামে একটি নতুন ফেতনা বের হয়েছে কুষ্টিয়াতে। তারা কুরআন মানে কিন্তু হাদিস মানে না। ৩০ পারা কুরআনের ব্যাখ্যা মহান আল্লাহ্ তাঁর রসুল মুহাম্মদ (স:) কে শিখিয়েছেন, আর মুহাম্মাদ (স:) তাঁর সাহাবাদের শিখিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে শুধু নামাজ পড়তে বলা হয়েছে, কিন্তু কোন নামাজ কত রাকাত --- তা কুরআনে নাই, আছে হাদিসে। কাজেই তারা যদি শুধু কুরআন মানে, তাহলে কোন ওয়াক্তে নামাজ কত রাকাত, তা তারা কিভাবে জানবে? কুরআনের ব্যাখ্যা হলো রসুলুল্লাহ্ (স:) এর হাদিস। কুরআনের ব্যাখ্যা করতে হবে কুরআন দিয়ে এবং হাদিস দিয়ে; কোন মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। (মুফতি এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী, ২০২৩)

৯. তাকলিদ কি ও কেন? (What is Taqlid and Why is It Necessary?)

তাকলিদ অর্থ অনুসরণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় ফকিহ ও মুজতাহিদের ইজতিহাদ (আহকাম) মেনে চলার নাম তাকলিদ। যিনি তাকলিদ করেন, তাকে মুকাল্লিদ বলে। যারা কুরআন ও সুন্নাহ্ আলোকে বিধি-বিধান তৈরী করতে পারে না, তাদের ফকিহদের (Islamic jurists) করা বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাসআলা মেনে চলা উচিত। যারা তাকলিদ করেন তারা দলিল-প্রমাণ তালাশ করেন না। তারা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন, মুজতাহিদ-ফকিহগণ কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিধি-বিধান দিয়েছেন। (নুরুন্নবী, ২০২২)। সুতরাং ইমামদের (ফকিহদের) কথা, লেখা ও কাজের অনুসরণ করাকে তাকলিদ বলে।

এই হিসাবে বাংলাদেশের ৯৮ ভাগ মুসলমান মুকাল্লিদ অর্থাৎ তাকলিদের অনুসারী। সাধারণ মানুষদের তাকলিদ করা খুবই প্রয়োজন এবং আশা করা যায় তাকলিদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের নিকটতম বান্দা হতে পারেন। তাকলিদের অর্থ এই নয় যে, বর্তমান সময়ে ইজতিহাদ করার দরকার নাই বা ইজতিহাদ করার মতো ফকিহ্ বা মুজতাহিদ নাই। মানুষ শুধু চার ইমামদের অনুসরণ করে চলবে, আর ইজতিহাদ করবে না যে নতুন বিষয়গুলোর সমাধান তাঁরা দেন নাই সেসকল বিষয়ে বর্তমান যুগের ফকিহ্ ও মুজতাহিদের ইজতিহাদ করে সমাধান

দিতে হবে। একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বক্তব্যে মোহাম্মাদ তাহিরুল্ কাদ্রি বলেন, "The door of ijtihad can never be closed because ijtihad is the name of Allah and none of the four imams of four madhabs ever said that the door of ijtihad was closed". (মোহাম্মাদ তাহিরুল্ কাদ্রি, ২০২২)। বাংলা অনুবাদঃ "ইজতিহাদের দরজা কখনও বন্ধ হতে পারে না, কারণ ইতিহাদ আল্লাহ্ নাম। তাছাড়া চার ইমামের কেহ কখনও বলেন নাই যে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে"।

আমার মতে, কোন ইমাম বা ফকিহ (Islamic jurist) বলতে পারেন না যে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান কালের আলিমরা বলতে পারেন যে আমারা এবং সাধারণ জনগণ বর্তমান সময়ের এবং পূর্বের সকল ইজতিহাদ মেনে চলবো এবং সাথে সাথে বর্তমান সময়ে বা ভবিষ্যতে যত নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে সেগুলো বর্তামান এবং ভবিষ্যৎ কালের মুজতাহিদ্রা ইজতিহাদ করে সমাধান দেবেন। তাহলেই কেবল মুসলিম বিশ্ব বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের উন্নয়নের সাথে তালমিলিয়ে চলতে পারবে। আর যদি ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে মুসলিম বিশ্ব উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে পড়বে এবং সেকেলে মানুষ বলে প্রগতিশীলরা তাদের প্রত্যাখান করবে।

কিছু বর্তমান কালের পশ্চিমা আইনবিদরা বলেছেন যে, ইসলামী ইতিহাসের হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ দিকে) কিছু ইসলামী আইনবিদ (some Islamic jurists) বলেছেন, আর ইজতিহাদ চলবে না। ইজতিহাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু তাকলিদ হবে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ইমামদের ইজতিহাদ মেনে চলতে হবে। এ সকল পশ্চিমা আইনবিদদের মধ্যে জোসেফ শাখৎ (Joseph Schacht) অন্যতম। তিনি তার লেখায় উল্লেখ করেছেনঃ

> "By the beginning of the Hijrah forth century (equivalent to Christian era ninth century) the point had been reached when the Muslim scholars of all schools felt that all essential questions had been thoroughly discussed and finally settled and a consensus gradually established itseft to the effect that from that time onwards no one might be deemed to have the necessary qualifications for independent reasoning in law (Ijtihad) and that all future activities would have to be confined to the explanation, application and at the most, interpretation of the doctrine of ijtihad as it had been laid down once and for all. This closing of the door of ijtihad amounted to the demand for taqlid to mean the unquestioning acceptance of the doctrines of the established schools and authorities." (জোসেফ শাহ্, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৭০-৭১)

অয়েল বি. হাল্লাক বলেছেন (Wael B. Hallaq), "A systematic and chronological study of the original Islamic legal sources reveals that the views on the closure of ijtihad after Hijrah second century/ Christian era eight century are entirely baseless and inaccurate The gate of ijtihad was not closed in theory nor in practice.... Ijtihad was indispensible in the Islamic legal theory." বাংলা অনুবাদঃ "আমরা যদি ইসলামী আইনের উৎসগুলো নিয়মানুগ ও কালানুক্রমিক গবেষণা করি তাহলে দেখতে পাব যে ইজাতিহাদের দরজা কোন কালেও বন্ধ হয় নাই এবং দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে) ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে-- এ কথার কোন ভিত্তি নেই এবং এ কথা সঠিক নয়"। (অয়েল বি. হাল্লাক, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১২০)

অয়েল বি. হাল্লাক তাঁর লেখায় আরও বলেছেন, যেসকল ব্যক্তিবর্গ ইজতিহাদ বন্ধ ঘোষনা করেছিল বা ইজতিহাদের বিরোধিতা করেছিল, সুন্নী ইমাম ও আলেমগণ তাদেরকে অগ্রাহ্য করেছিল এবং ইজতিহাদের কাজ চালু রেখেছিল। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

> "An enquiry will disclose that ijtihad was not only exercised in reality, but that all groups and individuals who opposed it were finally excluded from the Sunnism." বাংলা অনুবাদঃ যেসকল ব্যক্তিবর্গ ইজতিহাদ বন্ধ ঘোষনা করেছিল বা ইজতিহাদের বিরোধিতা করেছিল, সুন্নী ইমাম ও আলেমগণ তাদেরকে অগ্রাহ্য করেছিল এবং ইজতিহাদের কাজ চালু রেখেছিল। (অয়েল বি. হাল্লাক, ১৯৮৪, ভলিউম ১৬, পৃষ্ঠা ৪)

অয়েল বি. হাল্লাক তাঁর লেখায় আরও বলেছেন, "By chronologically analyzing the relevant Islamic literature on the subject of the closure of ijtihad from the Hijrah fourth /C.E. tenth century onwards, it will become clear that (1) Jurists who were capable of ijtihad existed at nearly all times; (2) Ijtihad was exercised in developing Islamic law after the formation of the Islamic schools; (3) Up to 500 Hijrah century there ware no mention whatsoever of the phrase "the closure of the gate of ijtihad" (In Arabic "insidad bab al-ijtihad") that may have alluded to the notion of the closure, (4) The controversy about the closure of the gate of ijthad prevented jurists from reaching a consensus to that effect." বাংলা অনুবাদঃ "আমারা যদি ইসলামি সাহিত্যগুলো কালানুক্রমিক বিশ্লেষন করি তাহলে আমারা দেখতে পাবো যে সবযুগে যোগ্য মুজতাহিদ ছিলেন এবং তাঁরা সবসময় ইজতিহাদ করেছিলেন। কোনো যুগে বা শতাব্দীতে ইসলামী জুরিষ্টরা একমত হতে পারেন নাই যে ইজতিহাদদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, আর ইজতিহাদ করা যাবে না"। (অয়েল বি. হাল্লাক, ১৯৮৪, ভলিউম ১৬, পৃষ্ঠা ৪)

কিন্তু জোসেফ শাহ্ সেই ইসলামিক জুরিষ্টদের নাম উল্লেখ করেন নাই বা তাদের কোন্ বইতে তাকলিদের কথা বলেছেন তা উল্লেখ করেন নাই। জোসেফ শাহ্ তার বই 'An Introduction to Islamic Law'-এ তাকলিদের পক্ষে কথা বলা আলেমদের নাম সরাসরি উল্লেখ করেননি। শাহ্ মূলত ইসলামী আইনের বিকাশ এবং ইজতিহাদ থেকে তাকলিদের দিকে ইসলামী আইনগত চিন্তার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ইসলামী আইনের ইতিহাসে তাকলিদের উদ্ভব, এর প্রভাব এবং কিভাবে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাকলিদ ইসলামী আইনশাস্ত্রে প্রধান পন্থা হয়ে ওঠে, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে, তিনি কোন নির্দিষ্ট আলেমের নাম উল্লেখ করেননি যারা সরাসরি তাকলিদের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেছেন।

শাখত তার বইতে উল্লেখ করেছেন যে, হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী) শুরুতে মুসলিম আলেমরা ইজতিহাদের যুগ সমাপ্ত বলে বিবেচনা করতে শুরু করেন এবং পরবর্তী আলেমদের তাকলিদ করার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মত পোষণ করেন। এই ধারায় আলেমদের একটি সাধারণ ঐকমত্য গড়ে ওঠে, কিন্তু শাখত এখানে কোন নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করেননি। এই বইয়ে শাখত ইসলামী আইনগত চিন্তার ধারাবাহিকতা এবং তাকলিদের উদ্ভব নিয়ে তার বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। (জোসেফ শাহ্, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৭০-৭২)

একইভাবে জে.এন.ডি. এ্যানডারসন (J.N.D Anderson) তাঁর বইতে লিখেছেনঃ হিজরী তৃতীয় শতাব্দী (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর) শেষ দিকে অনেকের মতে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনিও কোন মুসলিম জুরিষ্টদের নাম উল্লেখ করেন নাই। (এ্যানডারসন, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৭)

একইভাবে এইচ.এ.আর. গিব (H.A.R. Gibb) বলেছেন, "প্রথমদিকের মুসলিম মনিষীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ দিকে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা আর কখনও খোলা হবে না।" (গিব, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ১৩)।

শতকের শেষ দিকে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা আর কখনও খোলা হবে না।" (গিব, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ১৩)। সি.এল. ওসট্রোরগ (C.L. Ostrorog) লিখেছেন, "কিছু মনিষী বলেছেন ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে"। (ওসট্রোরগ, ১৯২৭, পৃষ্ঠা ৩১)

১০. তাকলিদ্ সম্পর্কে পূর্বেকার আলেমদের মতামত (The Opinions of Classical Ulama on Taqlid)

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে (খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শুরুতে) এমন একটি অবস্থানে পৌঁছানো হয়েছিল যখন সমস্ত মাজহাবের মুসলিম আলেমরা মনে করেছিলেন যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ ভালোভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে সমাধান করা হয়েছে। এর ফলে ধীরে ধীরে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সেই সময় থেকে আর কেউ আইনগত বিষয়ে স্বাধীন যুক্তি (ইজতিহাদ) প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হতে পারে না। পরবর্তী সময়ে সব কার্যক্রমকে ইজতিহাদের নীতির ব্যাখ্যা, প্রয়োগ এবং সবচেয়ে বেশি হলে তার ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, যা একবার এবং চিরস্থায়ীভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। এই ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়া মানে ছিল প্রতিষ্ঠিত মাজহাব এবং কর্তৃপক্ষের মতামতগুলোকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়ার (তাকলিদ) দাবি। এই ধারণাটি, যে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং মূলত বিভিন্ন মুসলিম মাজহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের (beween thirteenth and fifteenth century ulama) মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। বিশেষত এই আলেমরা হলেনঃ

১. ইবন সালাহ (মৃত্যু ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

ইবন সালাহ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইসলামী আলেম, যিনি তাকলিদ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতাওয়া ইবন সালাহ' এ তিনি তাকলিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইবন সালাহের মতে, সাধারণ মানুষের জন্য তাকলিদ করা বাধ্যতামূলক, কারণ তারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখে না। তবে তাকলিদ শুধুমাত্র সেই আলেমদের ফতোয়া অনুসরণ করতে হবে যারা ইসলামী আইন এবং ফিকহের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। (ইবন সালাহ, ১৯৮৬, ৯৩)

ইবন সালাহ স্পষ্টভাবে বলেন যে, ইজতিহাদ করার যোগ্যতা শুধুমাত্র বিশিষ্ট আলেমদের রয়েছে, আর সাধারণ মানুষকে তাদের উপর নির্ভর করতে হবে। যেহেতু সাধারণ মানুষ কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহের বিস্তারিত জ্ঞান রাখে না, তাদের জন্য তাকলিদ করা আবশ্যক। ইজতিহাদের চর্চা শুধুমাত্র তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা উচ্চতর ফিকহি জ্ঞান এবং যোগ্যতা রাখেন। ইবন সালাহর মতে, যারা ইজতিহাদ করতে পারেন, তাদের তাকলিদ করার প্রয়োজন নেই, তবে যারা ইজতিহাদের যোগ্য নন, তাদের তাকলিদ করা আবশ্যক।

ইবন সালাহ তাকলিদকে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য মনে করেননি, তিনি মনে করতেন যে এমন অনেক আলেমও আছেন যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তারা আগের আলেমদের ফতোয়া অনুসরণ করে ইসলামী আইনের প্রয়োগ করতে পারেন। ইবন সালাহর মতে, ইজতিহাদের যুগ শেষ হওয়ার কারণে নতুন ইজতিহাদ করার দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন:

> "ইজতিহাদের যুগ শেষ হয়েছে এবং বর্তমান সময়ের আলেমরা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী আলেমদের ফতোয়া অনুসরণ করতে পারেন।" (ইবন সালাহ, ১৯৮৬, ৪৪)

২. আল-আমিদি (মৃত্যু ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দ)

সাইফ আল-দিন আল-আমিদি (মৃত্যু ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইসলামী ফকিহ এবং তাত্ত্বিক। তিনি শাফি মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইসলামী আইন ও তত্ত্ব নিয়ে ব্যাপকভাবে লেখালেখি করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-ইহকাম ফি উসূল আল-আহকাম ("আইনগত তত্ত্বের মূলনীতি")-এ তিনি তাকলিদ (অন্যের ফতোয়া বা মতামত অনুসরণ করা) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল-আমিদির তাকলিদ সংক্রান্ত মতামত বেশ জটিল এবং প্রাসঙ্গিক। আল-আমিদি তার আল-ইহকাম ফি উসূল আল-আহকামগ্রন্থে ইজতিহাদের যোগ্যতা এবং তার সময়ে স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আলেমদের অনেকেই ইজতিহাদ থেকে সরে এসে তাকলিদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। (আল-আমিদি, ১৯১৩, ভলিউম ৪, পৃ. ৩০৭)।

আল-আমিদি স্বীকার করেন যে, মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশ, যারা ইজতিহাদ (স্বাধীনভাবে আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ) করার যোগ্যতা রাখে না, তাদের জন্য তাকলিদ করা অপরিহার্য। তিনি মনে করতেন যে, যারা ইসলামী আইনের মৌলিক নীতিগুলি, কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহের অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে না, তারা ইজতিহাদ করতে সক্ষম নয়। এই কারণে, সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের মতামত অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয়।

তিনি বলেন:

> "সাধারণ মানুষের জন্য ফিকহের বিষয়ে আলেমদের অনুসরণ করা বৈধ এবং বাধ্যতামূলক, কারণ প্রতিটি ব্যক্তির মুজতাহিদ স্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।" (আল-আমিদি, ১৯১৩, ভলিউম ৪, পৃ. ৩০৮)।

আল-আমিদি সাধারণ মানুষের আইনগত সমস্যাগুলির সমাধান করতে আলেমদের উপর নির্ভরশীলতাকে একজন সাধারণ মানুষের চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীলতার সাথে তুলনা করেছেন। যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ তার অসুস্থতার জন্য একজন চিকিৎসকের পরামর্শের উপর ভরসা করেন, তেমনই তাদের ইসলামী আইনগত প্রশ্নের সমাধানে আলেমদের মতামত অনুসরণ করা উচিত।

আল-আমিদি আলেমদের জন্য তাকলিদ করার ব্যাপারে আরও সমালোচনামূলক মনোভাব পোষণ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, তাদের অন্য আলেমদের মতামত বিনা অনুসন্ধানে গ্রহণ করা উচিত নয়। আল-আমিদির মতে, একজন আলেমের প্রধান দায়িত্ব হল স্বাধীনভাবে আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (ঐক্যমত্য), এবং কিয়াস (দৃষ্টান্তমূলক যুক্তি) এর ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগ করা।

তিনি লিখেছেন:

> "যে আলেম ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, তার জন্য অন্যদের মতামতকে বিনা প্রমাণে অনুসরণ করা বৈধ নয়।" (আল-আমিদি, ১৯১৩, ভলিউম ৪, পৃ. ৩০৯)।

আল-আমিদি ইজতিহাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলিও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যারা এই যোগ্যতা অর্জন করেন, তাদের জন্য তাকলিদ না করে স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। এই যোগ্যতাগুলির মধ্যে রয়েছে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহের মূলনীতি, আরবি ভাষার উপর গভীর জ্ঞান এবং কিয়াস প্রয়োগের সক্ষমতা। তিনি বিশ্বাস

করেন যে, যারা এই মানদণ্ড পূরণ করেন না, তারা তাকলিদ করতে পারে; কিন্তু যারা পূরণ করেন, তাদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে যুক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

আল-আমিদি তাঁর সময়ে ইজতিহাদ এবং তাকলিদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, অনেক আলেম আগের আলেমদের মতামত অনুসরণ করতে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইজতিহাদ থেকে সরে এসেছিলেন। তিনি এই প্রবণতাকে সমালোচনা করেন এবং মনে করেন যে, ইসলামী আইনের গতিশীলতা বজায় রাখতে ইজতিহাদ অপরিহার্য। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন যে, তাঁর সময়ের অনেক আলেম আর ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন না, এবং তাই তাকলিদ হয়ে ওঠে প্রধানত ব্যবহৃত পদ্ধতি।

আল-আমিদির তাকলিদ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য তাকলিদকে একটি প্রযোজনীয়তা হিসাবে সমর্থন করেছেন, কিন্তু তাকলিদকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার প্রবণতা আলেমদের জন্য সমালোচনা করেছেন। আল-আমিদি বিশ্বাস করেন যে, যোগ্য আলেমদের জন্য ইজতিহাদ অপরিহার্য এবং ইসলামী আইনকে সময়োপযোগী রাখতে স্বাধীন যুক্তি প্রযোগ করতে হবে। তবে সাধারণ মানুষের জন্য তাকলিদ একটি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ছিল তার দৃষ্টিতে। (আল-আমিদি, ১৯১৩, ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ৩০৮-৩০৯।

৩. ইবন খালদুন (মৃত্যু ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ)

ইবন খালদুন (মৃত্যু ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানী, যিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমা (Muqaddimah)-এ ইসলামী আইনের বিকাশ এবং তাকলিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তার সময়ে ইসলামী আইনের পরিবর্তন এবং ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার পর তাকলিদকে প্রাধান্য দেওয়া নিয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদুন তার আল-মুকাদ্দিমাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং পরবর্তী আলেমদের মধ্যে এই মতামত প্রাধান্য পেয়েছিল যে, আইনগত যুক্তির সর্বোচ্চ সীমা পৌঁছে গিয়েছে, এবং নতুন আইনি চিন্তা আর উৎসাহিত করা হয়নি। এই আলেমরা এবং তাদের লেখায় ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার ধারণা এবং তাকলিদের প্রাধান্য সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালে ইসলামী আইনি চিন্তায় প্রচলিত হয়। (ইবন খালদুন, ভলিউম ২, ১৯৬৭, ৫৩২)।

ইবন খালদুন উল্লেখ করেন যে, ইসলামী আইনের বিকাশের একটি পর্যায়ে ইজতিহাদের যুগ কার্যত সমাপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক যুগের মহান মুজতাহিদ আলেমদের যুগ শেষ হওয়ার পর ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং আলেমরা পূর্ববর্তী ফিকহ আলেমদের সিদ্ধান্তগুলোকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

> "ইজতিহাদের যুগ শেষ হয়েছে এবং পরবর্তীকালে মুসলিম আলেমরা পূর্ববর্তী মাজহাবের আলেমদের সিদ্ধান্ত এবং ফতোয়াগুলোর উপর নির্ভর করা শুরু করেন।" (ইবন খালদুন, ভলিউম ২, ১৯৬৭, ৫৩২)।

ইবন খালদুন উল্লেখ করেন যে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার পর মুসলিম সমাজে তাকলিদ একটি সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মনে করেন যে, ফিকহি জ্ঞান এবং যোগ্যতার অভাবে অনেক আলেম এবং সাধারণ মানুষ তাকলিদ করাকে অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। ইবন খালদুন এটি ব্যাখ্যা করেন যে, ইসলামী আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এটি প্রযোজনীয় হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তিনি এও মনে করেন যে, এই প্রবণতা আইনের স্থবিরতা তৈরি করতে পারে। ইবন খালদুনের মতে, যদিও তাকলিদ প্রাথমিকভাবে একটি প্রযোজনীয় পদক্ষেপ ছিল, এটি ইসলামী আইনের বিকাশকে সীমিত করে ফেলেছিল। তিনি সমালোচনা করেন যে, অনেক আলেম নতুন চিন্তা বা যুক্তি প্রয়োগ না করে

পূর্ববর্তী আলেমদের সিদ্ধান্তগুলোকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছেন। ইজতিহাদের অভাব ইসলামী আইনের প্রগতিশীলতায় একটি বাধা সৃষ্টি করেছে বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন: "তাকলিদ নতুন চিন্তা এবং আইনি যুক্তির সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে, যা ইসলামী আইনের প্রগতিশীল বিকাশকে ব্যাহত করেছে।" (ইবন খালদুন, ভলিউম ২, ১৯৬৭, ৫৩৪)

ইবন খালদুন ইসলামী আইনগত চিন্তার বিকাশে তাকলিদের গুরুত্ব এবং এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ইজতিহাদের যুগ শেষ হওয়ার পর তাকলিদ মুসলিম সমাজে অপরিহার্য হয়ে ওঠে, কিন্তু এটি ইসলামী আইনকে স্থবির করে দিতে পারে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইসলামী আইনের নতুন দৃষ্টিকোণ এবং চিন্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার সমালোচনামূলক মন্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক।

১১. নবী মুহাম্মদ (সা.) ইজতিহাদ করেছিলেন কিনা? (Did Prophet Muhammad (s.a.w.s.) Carry out Ijtihad?)

নবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন শেষ রাসূল, যিনি কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। যদিও তিনি সরাসরি ওহি পেতেন, এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে তিনি কুরআন বা পূর্ববর্তী ওহির বাইরে গিয়ে নিজের বিচার-বিবেচনা (ইজতিহাদ) ব্যবহার করেছেন। তবে, যদি তিনি কোনো ইজতিহাদে ভুল করতেন, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তাকে ওহির মাধ্যমে সংশোধন করতেন, যা তার রায়গুলোকে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী করত।

নবী মুহাম্মদ (স.) এর ইজতিহাদের প্রমাণ নিম্নরুপ

১. বদরের বন্দিদের ঘটনা

বদরের যুদ্ধে বন্দিদের কী করা হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, কুরআনে বা পূর্ববর্তী ওহিতে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল না। তখন নবী (সা.) সাহাবিদের পরামর্শ নেন। আবু বকর (রা.) দয়া দেখিয়ে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন, আর উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরামর্শ দেন। নবী (সা.) আবু বকরের মতামতের দিকে ঝুঁকেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পরে একটি কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে নবীকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এ প্রসংগে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে:

"যতক্ষণ পর্যন্ত দেশ পুরোপুরি জয় করা না হয়, একজন নবীর জন্য বন্দি নেওয়া বৈধ নয়..." (কুরআন ৮:৬৭)।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে নবী (সা.) ইজতিহাদ ব্যবহার করেছিলেন, যেখানে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল না, তবে পরে আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত সংশোধন করে দিয়েছিলেন (সহিহ মুসলিম, হাদিস ৪৩৬০)।

২. খেজুরের পরাগায়ন

মদিনার কিছু কৃষক নবীকে (সা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন খেজুরের গাছের পরাগায়ন সম্পর্কে। নবী (সা.) তাদের পরাগায়ন বন্ধ করার পরামর্শ দেন, মনে করেছিলেন যে এটি প্রযোজনীয় নয়। কিন্তু সেই বছর খেজুরের ফলন কম হওয়ার পর নবী (সা.) বললেন:

"তোমরা তোমাদের জাগতিক বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস ৫৮৩১)

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে পৃথিবীর বা জাগতিক বিষয়ে, যেখানে সরাসরি ধর্মীয় নির্দেশনা ছিল না, নবী (সা.) তার নিজস্ব বিচার-বিবেচনা (ইজতিহাদ) ব্যবহার করতেন, এবং যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন ফল দেখাতো, তিনি তা গ্রহণ করতেন।

৩. খন্দকের যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধে যখন মদিনা অবরোধের মধ্যে ছিল, তখন নবী (সা.) প্রতিরক্ষার জন্য একটি খন্দক খোঁড়ার কৌশল গ্রহণ করেন, যা সালমান আল-ফারসি (র.) এর পরামর্শ ছিল। সামরিক কৌশল সম্পর্কে কোনো পূর্ববর্তী ওহি না থাকায় নবী (সা.) ইজতিহাদ প্রয়োগ করেন এবং সাহাবিদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস ৪৩৫)

৪. মাখজুম গোত্রের চুরির ঘটনার বিচার

মাখজুম গোত্রের একজন নারীর চুরির ঘটনা ইসলামী ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ঘটনাটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে নবী মুহাম্মদ (সা.) আইনের সাম্য ও ন্যায়বিচারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তা পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঘটনাটি এ রূপে বর্ণিত হয়েছে যে, মাখজুম গোত্রের ফাতিমা নামক একজন মহিলা চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। মাখজুম গোত্র ছিল মক্কার একটি প্রভাবশালী গোত্র, এবং তাদের মধ্যে এই মহিলার সামাজিক অবস্থানও ছিল উচ্চ। চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কেটে ফেলার বিধান ইসলামে ছিল নির্ধারিত। তবে, এই মহিলা সামাজিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় কিছু লোক নবী মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি তার হাত কেটে ফেলার শাস্তি মওকুফ করেন এবং তৎপরিবর্তে অন্য কোন লঘু শাস্তি দেন।

সাহাবি উসামা ইবনে যায়েদ (রা.), যিনি নবী মুহাম্মদ পক্ষে সুপারিশ করতে নবী (সা.) এর কাছে পাঠানো হয়। (সা.) এর খুবই প্রিয় ছিলেন, তাকে ঐ নারীর উসামা (রা.) যখন নবী (সা.) এর কাছে এই বিষয়ে সুপারিশ করেন, তখন নবী মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বলেন:

> "যদি আমার কন্যা ফাতিমাও চুরির অপরাধে ধরা পড়তো, তবুও আমি তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিতাম, কারণ এটা আল্লাহ্র আইন।"
>
> (সহিহ বুখারী, হাদিস নম্বর ৬৭৮৭; সহিহ মুসলিম, কিতাব ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৮৭)

এই ঘটনা ইসলামে আইনের সামনে সবাই সমান এবং কোনো সামাজিক অবস্থান বা ক্ষমতা কারো জন্য ছাড় দিতে পারে না, সেই নীতির প্রতিফলন ঘটায়। নবী (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, ইসলামের শাস্তিমূলক আইনের ক্ষেত্রে কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হবে না, তা তিনি যতই প্রভাবশালী হোন না কেন। এই ঘটনাটি সামাজিক সাম্য, ন্যায়বিচার এবং ইসলামী শাস্তি

প্রদানের গুরুত্ব বোঝায়। নবী (সা.) এই ঘটনায় ইজতিহাদের মাধ্যমে বলেছিলেন যে, ইসলামে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আইনের সামনে সবাই সমান।

১২. ইজতিহাদ সবযুগে করা যাবে- এ ব্যাপারে মুসলিম মণিষীদের মতামত (The opinions of the Muslim Scholars that Ijtihad Can be Exercised in All Ages)

ইজতিহাদ হচেছ সমাজে উদ্ভুত কোন সমস্যার সমাধানকল্পে মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচেষ্টা। ইজতিহাদ সম্পর্কে মুসলিম মণিষীদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইজতিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যার মাধ্যমে ইসলামের মূল উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) থেকে নতুন সমস্যার সমাধান বের করা হয়। ইজতিহাদের ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতামত নিচে তুলে ধরা হলোঃ

১. ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) (মৃত্যুঃ ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ)

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বিশ্বাস করতেন যে ইজতিহাদ একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া এবং তিনি তাঁর নিজের সময়ে এর ব্যবহার করেছেন। তিনি ইসলামের মূল গ্রন্থের (কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার) বাইরে যুক্তি ও মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে ছিলেন, যাকে ইজতিহাদ বলা হয়। ইমাম আবু হানিফার অনুসারীরা ইজতিহাদকে ইসলামিক আইনবিদ্যার একটি মূল স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেন। (আল্লামা শিবলী নোমানী, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২১-১২৫; আহমদ হাসান, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৭৮-৮২; আবু লাইখ আল-মালিকী, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৭-৬৪)। তার রায় (যুক্তিসঙ্গত মতামত) এবং কিয়াস (তুলনামূলক যুক্তি) এর উপর নির্ভরশীলতা তার ইজতিহাদে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার প্রমাণ। যেখানে কুরআন বা সুন্নাহতে সরাসরি কোনো সমাধান নেই, সেখানে আবু হানিফা যুক্তি এবং তুলনার মাধ্যমে নতুন সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বিখ্যাতভাবে বলেছিলেন, "যদি কোনো বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, বা ইজমাতে (সম্মিলিত মতামতে) কোনো আধুনিক সমস্যার সমাধান বা ভিত্তি না থাকে, তাহলে আমি নিজের যুক্তির আশ্রয় নিই। "(ওয়েল বি. হাল্লাক, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১২০; জোসেফ শাখত, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)

২. ইমাম মালিক (রহঃ) (মৃত্যুঃ ৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ)

ইমাম মালিক (রহঃ) ইজতিহাদ সম্পর্কে উদার ছিলেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইজতিহাদ অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ, এবং সাহাবীদের আমল অনুযায়ী হতে হবে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুওয়াত্তা"তে তিনি বিভিন্ন ফতোয়া ও ইজতিহাদের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবীদের আমলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইজতিহাদের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। (ইমাম মালিক ইবনে আনাস, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২২-২৫; মোহাম্মদ আবু জাহরা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৭; উমর ফারুক আব্দুল্লাহ, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৮-৬৩)।

৩. ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) (মৃত্যুঃ ৮২০ খ্রিষ্টাব্দ)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইজতিহাদ সম্পর্কে একটি মধ্যম অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইজতিহাদ প্রয়োজনীয়, তবে তা অবশ্যই সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম মেনে করা উচিত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-রিসালাতে' তিনি ইজতিহাদের নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। (ইমাম শাফেয়ী, পৃষ্ঠা ৪৫৭-৪৬২)।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) (মৃত্যুঃ ৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) ইজতিহাদ সম্পর্কে একটি সতর্ক অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ইজতিহাদ তখনই করা উচিত যখন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া না যায়। তবে, তাঁর অনুসারীরা পরবর্তীতে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

৫. ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) (মৃত্যু: ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মনে করতেন যে ইজতিহাদ একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা সব যুগে চলতে থাকবে। তিনি ইজতিহাদকে ইসলামের একটি মৌলিক অংশ হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে মুসলিম সমাজের পরিবর্তনশীল প্রয়োজন মেটাতে ইজতিহাদের প্রয়োজন। (ইবনে তাইমিয়া, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ২০৩-২০৭)।

৬. মোহাম্মদ ইকবাল (রহঃ) (মৃত্যু: ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)

মোহাম্মদ ইকবাল (রহঃ) বিশ্বাস করতেন যে ইজতিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা মুসলিম সমাজের চিন্তাধারায় নতুনত্ব আনতে পারে। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রেকন্সট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম" এ বলেছেন যে ইজতিহাদের দরজা সব সময় খোলা থাকা উচিত, যাতে ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে যুগের প্রয়োজনের সমন্বয় সাধন করা যায়। (মোহাম্মদ ইকবাল, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৫২)

৭. শেখ ইউসুফ আল-কারাদাওয়ী (রহঃ) (জন্ম: ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ)

শেখ ইউসুফ আল-কারাদাওয়ী (রহঃ) সমকালীন মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম, যিনি ইজতিহাদের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, ইজতিহাদ মুসলিম সমাজে নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে সেগুলোর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর মতে, ইজতিহাদ সব যুগে করা উচিত কারণ সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হয়। (শেখ ইউসুফ আল কারদায়ী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৫-১১২)।

এই মতামতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, ইজতিহাদকে মুসলিম পণ্ডিতগণ সব সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে দেখেছেন এবং এটিকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। কাজেই ইজতিহাদ বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

১৩. উপসংহার (Conclusion)

উপেরর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, মুসলিম সমাজে নতুন কোন ইস্যুর উদ্ভব হলে, আলেম-উলামাদের ভিতর যারা মুজতাহিদ তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন ইস্যুর সমাধান দেন। আর যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন না তারা মুজতাহিদদের দেওয়া ইজতিহাদ অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করেন বা সমাজ জীবন পরিচালনা করেন। এভাবে চললে মুসলিম সমাজে কোন সমস্যার উদ্ভব হবে না এবং তারা আধুনিক বিশ্বের সাথে তালামিলিয়ে চলতে পারবে। তাছাড়া ইজতিহাদ মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করে। সে কারণে মুসলিমরা কোন যুগে বা শতাব্দীতে ইজতিহাদ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না; কারণ যুগ ও শতাব্দীর পরিবর্তনে পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর সে পরিবর্তনের আলোকে নতুন নতুন ইজতিহাদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে ইজতিহাদ অবশ্যই প্রামাণিক দলিলের ভিত্তিতে হতে হবে।

কোনো হাদিস হতে ইজতিহাদ করা হলে সেই হাদিসটি অবশ্যই প্রামাণিক হতে হবে অর্থাৎ হাদিসটি অবশ্যই সহীহ এবং মুত্তাসিল হতে হবে। ইজতিহাদটি উসুলুল ফিরে (ফিকাহের মূলনীতির) অনুসরণে হতে হবে এবং শরিয়তের মূল উৎসগুলোর সাথে কোন ভাবেই সাংঘর্ষিক হবে না। যারা দাবি করেছেন, হিজরী তৃতীয় শতকের পর (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পর) ইজতিহাদ করা বন্ধ হয়ে গেছে বা গিয়েছিল এ তথ্য সঠিক নয়। (ওয়েল বি. হাল্লাক,

পৃষ্ঠা ৪)। তাছাড়া ইজতিহাদ কোন শতাব্দীতে বন্ধ ছিল না। যোগ্য মুজতাহিদ্রা সব যুগে এবং সব শতকে ইজতিহাদ করেছিলেন এবং বর্তমানেও করছেন। (ওয়েল বি. হাল্লাক, পৃষ্ঠা ৪)। আর যারা বলে, আমরা "আহলে কুরআন" তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে। কারণ, তারা নিজেরাও কুরআনের অনেক আয়াত মেনে চলে না। কাজেই ইজতিহাদ অবশ্যই কুরআন বা প্রামাণিক হাদিসের ভিত্তিতে বা উভয়ের ভিত্তিতে হতে হবে এবং যারা ইজতিহাদ করবেন তাদেরকে অবশ্যই মুজতাহিদের যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র (Sources)

মুহাম্মাদ ফাইজউদ্দীন (প্রফেসর), ইসলামী আইনের পাঠ্যবই, শাম্স পাবলিকেশন, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫-৩৭।

মুহাম্মাদ হাশিম কামালী (প্রফেসর), ইসলামী আইনবিজ্ঞানের মূলনীতি, মালেশিয়া, ১৯৯১, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭।

আবু লাইখ আল-মালিকী, ফিকহ আল-ইমাম আবু হানিফাঃ হানাফি মাযহাবের মূল ফিকহি নীতিমালা, তুরাথ পাবলিশিং, লন্ডন, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৭-৬৪।

আল-গাজালী (ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালী), আল-মুস্তাফা মীন ইলম আল-উসূল, মুয়াসাৎ আর রিসালা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২৪৫-২৫০।

আল্লামা শিবলী নোমানী, ইমাম আবু হানিফাঃ তাঁর জীবন ও কর্ম, দারুল ইশাআত, করাচি, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২১-১২৫।

আহমদ হাসান, ইসলামী ফিকহের প্রাথমিক বিকাশ, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৭৮-৮২।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস, আল-মুয়াত্তা, দারুল যাব আল-ইসলামী, বেইরুত, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২২-২৫।

ইমাম শাফেয়ী, আল-রিসালা, পৃষ্ঠা ৪৫৭-৪৬২।

ইমাম গাজালী (রহঃ) (ইমাম মুহাম্মাদ আল-গাজালী রহঃ), আল মুছতাছফা মিন ইলম্ আল-উসুল (মুসলিম ফিকহের আইনতত্ত্ব সম্পর্কে" (প্রকাশকালঃ ১২শ শতাব্দী, কায়রো, পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫৪)।

ইবনে তাইমিয়া, মাজমু আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২০. পৃষ্ঠা ২০৩.২০৭।

ইউসুফ আল-কারাদাবি (শাইখ), জিহাদের ফিকহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৫-১১২।

মোহাম্মদ ইকবাল, রিকন্সট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৫২

ওয়েল বি. হাল্লাক, ইসলামী আইনের উৎস ও বিবর্তন, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১২০।

ওয়েল বি. হাল্লাক, ইজতিহাদের দরজা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে? ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মিডল ইস্ট স্টাডিজ, ১৯৮৪, ভলিউম ১৬, পৃষ্ঠা ৪।.

জোসেফ শাখত, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক ল', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩; ৭০-৭১।

এ্যান্ডারসন, জে.এন.ডি., ল' রিফর্ম ইন দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড, লন্ডন, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৭।

গিবু, এইচ.এ.আর., মডার্ন ট্রেন্ডস ইন ইসলাম, শিকাগো, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ১৩।

অস্ট্রোরগ, সি. এল., দ্য অ্যাঙ্গোলা রিফর্ম, লন্ডন, ১৯২৭, পৃ. ৩১।

মোহাম্মদ আবু জাহরা, দ্য লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অব ইমাম মালিক, দারুল ফিকর আল-আরবী, কায়রো, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৭।

সহিহ বুখারি, খণ্ড ৫. কিভাব ৫৯. হাদিস ৪৩৫. দারুস সালাম প্রকাশনা, রিয়াদ, ১৯৯৭। পৃষ্ঠা ৩৪৩।

সহিহ বুখারী, খণ্ডঃ ৮, হাদিস নম্বরঃ ৬৭৮৭, প্রকাশকঃ দার তাওক আল-নাজাত, প্রকাশনা স্থানঃ বৈরুত, লেবানন, ১৪২২ হিজরি (২০০১ খ্রিস্টাব্দ), পৃষ্ঠা ১১৬।

সহিহ মুসলিম, ২০০৭, কিতাব ৩০, হাদিস ৫৮৩১, দারুস সালাম প্রকাশনা, রিয়াদ, পৃষ্ঠা ১৭৩০।

সহিহ মুসলিম, কিতাব ১৭, হাদিস ৪১৮৭, দারুস সালাম প্রকাশনা, রিয়াদ, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৩৯৮।
সহিহ মুসলিম, কিতাব ৩২, হাদিস ৪৩৬০, দারুস সালাম প্রকাশনা, রিয়াদ, ২০০৭, পৃষ্ঠা ২০৪৬।
উমর ফারুক আব্দুল্লাহ, ইমাম মালিক অ্যান্ড মদিনাঃ ইসলামিক লিগ্যাল রিজনিং ইন দ্য ফরমেটিভ পিরিয়ড, ব্রিল পাবলিশার্স, লেইডেন, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৮-৬৩।
ইবন সালাহ, ফাতাওয়া ইবন সালাহ, বৈরুতঃ দার আল-মা'রিফাহ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৪৪, ১৩।
আল-আমিদি (সাইফ আল-দিন আল-আমিদি), আল-ইহকাম ফি উসূল আল-আহকাম (আইনগত তত্ত্বের মূলনীতি), কায়রোঃ মাতবাআত আল-সাদাহ, ১৯১৩, ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ৩০৭-৩০৯।
ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, ভলিউম ২, কায়রোঃ দার আল-ফিকর, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৫৩২-৫৩৪।
আবুল হুসাইন আল বাস্রি, আল মু'তামাদ ফি উসুল আল-ফিকহ, ইনিসটিটিউট ফ্রঁসেজ দ্য দামাস, ১৯৬৪, পৃ. ৫-৬।
আবু ইসহাক্ আল-সিরাজী, ফি উসুল আল-ফিকহ, কায়রো, ১৯০৮, পৃ. ৮৫-৮৬।
18959 সুরাহ্ আল ইমরান, ৩ঃ ১৬৪
সুরাহ্ আল বাকারাহ্, ২ঃ ১২৯।
সুরাহ্ আনফালঃ ১।
সুরাহ্ নিসা, ৪ঃ ১৪, ৮০, ১১৫।
সুরাহ্ আহযাবঃ ৩৬, ৭১।
সুরা নূরঃ ৫৪।
সুরাহ নাহলঃ ৪৪।
সুরাহ নাজমঃ ৩-৪।
মুফতি মাহমুদ হাসান, ইসলামে হাদিসের প্রামানিকতা, ২০২০, website: https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/01/25/866580.
শায়েখ আহমাদুল্লাহ, হাদিস অস্বীকার করা, ইসলাম অস্বীকার করার নামান্তর, ৩রা নভেম্বর ২০২২, website: https://www.ourislam24.com/2022/11/03/ifdIn
মুফতি এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী, নতুন ফেতনা আহলে কুরআন, website: youtube.com/watch?v=IN cct8bCMEk
নুরুন্নবী, ইজতাহাদ, মুজতাহিদ, মাযহাব, তাকলিদ ও মুকাল্লিদ-পরিচিতি, ২০২২. Website: https://m.facebook.com/permalink.php?
তাহিরুল্ল কাদির, ইজতিহাদের দরজা কি বন্ধ?, তৃতীয় ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্স কনফারেন্স ২০২০-এ প্রদত্ত ভাষণ, মিনহাজ ইউনিভার্সিটি, লোহোর, পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত।